Historical Background of Bangladesh (বাংলাদেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট)

Instructor:

Professor Md. Ataur Rahman Biswas

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের বৈচিত্র্যময় গতিপথ

- বাংলাদেশ একটি ইতিহাসঋদ্ধ দেশ। এর ভৌগোলিক অবস্থান এমন এক স্থানে অবস্থিত যা প্রাচীনকাল থেকেই নানা জাতি ও সংস্কৃতির মিলনস্থল হিসেবে পরিচিত। প্রাচীনকালে পূর্ব ভারতের যে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বাঙালি জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিলো আজকের বাংলাদেশ তার একটি অংশ মাত্র। এ অঞ্চল ও এর মানুষ নানা কৌম সমাজ বা স্বতন্ত্র জনপদে বিভক্ত ছিলো। নানা ঘাত-প্রতিঘাত, সংযোজন বিয়োজনের মাধ্যমে একটি ভৌগোলিক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়ে কালক্রমে বঙ্গ. থেকে বঙ্গাল বা বাঙ্গালা বা বাংলা, সুবে বাংলা, নিজামত, বেঙ্গল, পূর্ব বাংলা, পূর্ব পাকিস্তান এবং পরিশেষে স্বাধীন বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির অভ্যুদয়। অষ্টম শতাব্দীতে পাল বংশ প্রতিষ্ঠার ফলে বাঙালির স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সত্তা মূর্ত হয়ে উঠলেও বিভিন্ন বিদেশী বিশেষ করে ঔপনিবেশিক শক্তির আগমন ও হস্তক্ষেপের ফলে এর স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব হয় নি। তখন থেকে বাংলা যেসব শাসনাধীনে আসে সেগুলো হচ্ছে: পাল বংশ (অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি), দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক থেকে আগত সেন বংশ (একাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরু), তুর্কি এবং আফগান সুলতানি শাসন (১২০৪-১৫৭৫), মুগল সুবাদারি-নবাবি শাসন (১৫৭৬-১৭৫৭), ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন (১৭৫৭-১৮৫৭), ব্রিটিশ রাজ-এর শাসন (১৮৫৮-১৯৪৭) এবং সবশেষে পাকিস্তানি শাসন (১৯৪৭-১৯৭১)। এরপর ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জিত হয়। স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে দেশটি সামরিক শাসন, গণতান্ত্রিক আন্দোলন, এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে একটি উন্নয়নশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করছে।

প্রাচীন জনপদ: রাজনীতির সূচনা

- ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বাংশ তথা বাংলা অঞ্চলে আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ছোটো ছোটো অনেক ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পরিচয় গড়ে উঠতে শুরু করে। একক ও ঐক্যবদ্ধ কোনো রাজ্য বাংলা অঞ্চলে ছিল না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাম-পরিচয়গুলোকে বলা হয় জনপদ বা ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক একক। জনপদগুলো গড়ে উঠেছিল বাংলায় আর্য ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের আগমনের বহু আগেই। প্রাচীনকালে লিখিত বৌদ্ধ ও সংস্কৃত গ্রন্থগুলো থেকে আমরা যে কটি জনপদের নাম জানতে পারি, তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকটির পরিচয় জেনে নেই।

বঙ্গ: বর্তমান বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব দিকে এর অবস্থান ছিলো। বর্তমা। ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল ও ফরিদপুর এর অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এটি ২ ভাগে বিভক্ত ছিলো

- বিক্রমপুর : পদ্মার উত্তর পাড় এলাকা (মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও নারায়নগঞ্জ)
- নাব্য: পদ্মার দক্ষিণাঞ্চল (ফরিদপুর, বরিশাল ও পটুয়াখালী)।

পুণ্ড্র: এটি ছিলো বাংলার সবচেয়ে প্রাচীনতম জনপদ। বৃহত্তর বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিলো। এই জনপদের কেন্দ্র ছিলো পুণ্ড্রনগর। এরই একটি অংশের নাম প্রাচীনকালে বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

সমতট: সমতট ছিলো বাংলার দক্ষিণ পূর্বাংশের জনপদ। মেঘনা নদীর পূর্ব তীর থেকে শুরু করে বর্তমান কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও ভারতের ত্রিপুরার প্রধান অংশ নিয়ে এই জনপদ গড়ে উঠেছিলো। বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র ছিলো প্রাচীন সমতট।

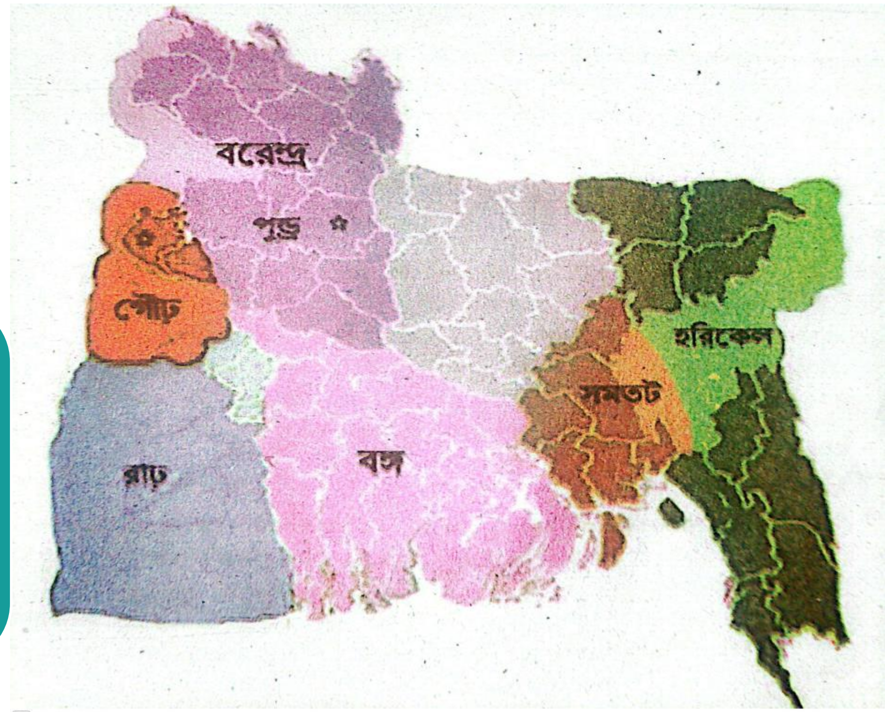

হরিকেল: চট্টগ্রামে প্রাপ্ত জনৈক কান্তিদেব নামক নৃপতি পদত্ত তাম্রশাসনে হরিকেল জনপদের নাম পাওয়া যায়। চৈনিক পরিব্রাজক ইতশিং- এর মতে হরিকেল ছিলো প্রাচ্য দেশের পূর্ব সীমায় অবস্থিত জনপদ। বর্তমান সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে এই জনপদটি গঠিত ছিলো।

রাঢ়: বাংলা অঞ্চলের পশ্চিমে বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথী নদীর উভয় তীরের এক বিস্তৃত জনপদ হিসেবে ছিল এর অবস্থান। দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত এই জনপদ বিস্তৃত ছিল। রাঢ় এলাকাতেই আজ থেকে প্রায় দুই হাজার বছর আগে তাম্রলিপ্তি নামে একটি নৌ এবং সমুদ্রবন্দর গড়ে উঠেছিল। বাংলার সবচেয়ে পুরোনো এই বন্দর ধরে বাংলার শস্য, বস্ত্র, সুগন্ধি মসলা গ্রিসসহ বর্তমান ইউরোপের নানান স্থানে রপ্তানি হতো।

গৌড়: বর্তমান চাঁপাইনবাবগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বর্ধমান্ ও নদীয়া জেলা নিয়ে এই জনপদটি গড়ে উঠেছিলো।

- বাংলার প্রাচীন এই জনপদগুলোর কথা আমরা জানতে পারি প্রধানত বৈদিক সাহিত্য থেকে। বৈদিক সাহিতা রচিত হয়েছিল আর্য ভাষার মানুষের হাতে। এসব গ্রন্থে বাংলার প্রাচীন জনপদের কথা এলেও খুব সম্মানজনকভাবে আসেনি। এর কারণ হলো, প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে যখন আর্য ভাষাগোষ্ঠীর মানুষেরা বাংলা অঞ্চলে প্রবেশ করছিলেন তখন এই অঞ্চলে অনেক আগে থেকে যাঁরা বসবাস করছিলেন তাঁদের বাধার মুখে তাঁরা পড়েছিলেন। আধিপত্য বিস্তারে এই দ্বন্দ্বের কারণেই সেই সময়ের সংস্কৃত সাহিত্যে বাংলা অঞ্চলের মানুষদের তুচ্ছ করে দেখানো হয়েছে।যাহোক, আর্যদের মধ্য থেকেই একসময় মৌর্য, গুপ্ত প্রভৃতি শক্তিশালী রাজবংশের উত্থান ঘটে। এইসব রাজশক্তির হাত ধরে বাংলায় আর্য ভাষাগোষ্ঠীর সংস্কৃতি বা বৈদিক সংস্কৃতি প্রবেশ করে। ধীরে ধীরে এইসব জনপদের নগরকেন্দ্রিক মানুষের ওপরও আর্য ধর্ম ও ভাষা-সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

মৌর্য শাসনামলে বাংলা: মৌর্য রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, একজন উজ্জ্বল সামরিক কৌশলবিদ এবং চতুর শাসক। চন্দ্রগুপ্ত 322 খ্রিস্টপূর্বাব্দে নন্দ সাম্রাজ্যকে উৎখাত করে মৌর্য রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তার উচ্চাভিলাষী বিজয়ের ফলে বর্তমান আফগানিস্তান থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল একীভূত হয়।। মৌর্য বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোকের (২৬৯-২৩২খ্রি.পূ.) রাজত্বকালে উত্তর বাংলার বৃহদাংশ মৌর্যদের দখলে গিয়েছিল। মহাস্থানগড় এর নিকটবর্তী স্থানে প্রাপ্ত একটি শিলালিপির ভাষ্য হতে বাংলাদেশে মৌর্য শাসন বিস্তৃত হয়েছিল বলে ধরা হয়। এই শিলালিপিতে যদিও অশোকের নাম সরাসরি উল্লেখ নেই, তবে এই লিপির ভাষ্য বিশ্লেষণ করে 'পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তিটির' রাজধানী হিসেবে আজকের বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়কে চিহ্নিত করা হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হলে খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দে বগুড়ার মহাস্থানগড়ে উন্নত এক সংস্কৃতির পত্তন করেছিলেন মৌর্য বংশের রাজারা। ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে উত্তর বাংলা মৌর্য রাজবংশের কাছে পরাভূত হলে মহাস্থানগড়ে একটি প্রদেশ গড়ে তোলা হয়। তখন এর নাম ছিল 'ভুক্তি'। উত্তর বাংলার এই মৌর্য প্রদেশের নামই 'পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি' ছিল বলে ইতিহাসবিদগণ মনে করেন। আজকের এই মহাস্থানগড় অঞ্চলের 'পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি'র রাজধানী ছিল পুণ্ড্রনগর। পুণ্ড্রনগর বা মূল রাজধানী শহরটি ছিল অনেকটা দেয়াল ঘেরা দুর্গের মতো। লিখনশৈলী ও বক্তব্য বিশ্লেষণ করে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকগণ বাংলাদেশের মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত ব্রাহ্মী শিলাফলক লিপিটিকে অশোকের আমলের বা অন্তত মৌর্য আমলের বলে দাবি করেন।

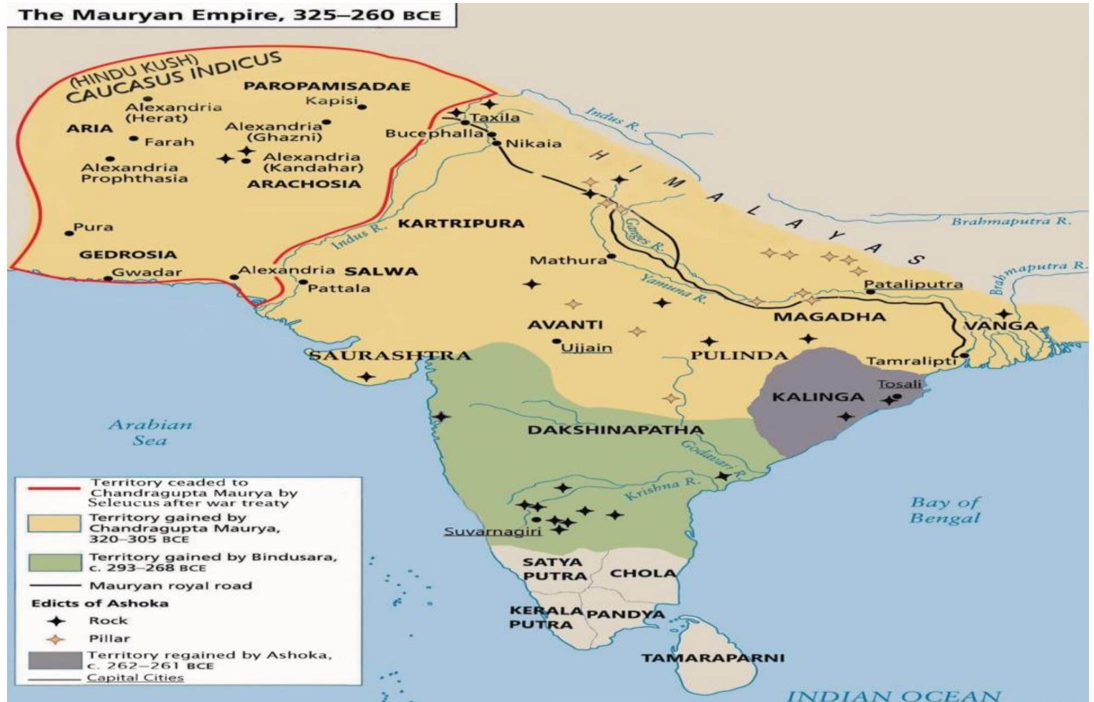

মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত ব্রাহ্মী শিলালিপি

• গুপ্ত শাসনামলে বাংলা:

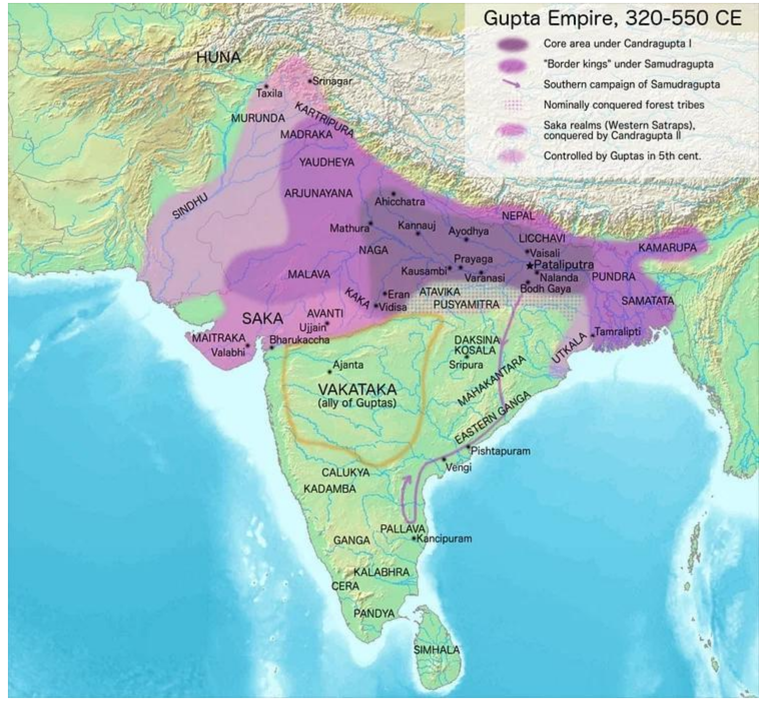

মৌর্যদের পর উত্তর ভারতে শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করেন গুপ্ত বংশের সম্রাটগণ। এই বংশের সম্রাটদের মধ্যে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত প্রমুখ নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তথ্যপ্রমাণ থেকে জানা যায়, খ্রিস্টীয় প্রায় ৪ শতকের শুরুতে (৩২০ সালে) উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রথম গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সময়েই সমগ্র বাংলায় (সমতট ব্যতিত) গুপ্ত আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। সমগ্র উত্তর বাংলা যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সরাসরি অধীন ছিল তা এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তাম্রশাসন সমূহের ভিত্তিতে প্রমাণিত। প্রথম কুমারগুপ্তের সময় (৪৩২-৪৪৮ খ্রি.) থেকে উত্তর বাংলা গুপ্ত সাম্রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বিভাগ হিসেবে গড়ে ওঠে। এটির নাম ছিল তখন ‘পুন্ড্রবর্ধন ভুক্তি’। বুধগুপ্তের দামোদরপুর তাম্রশাসন (৪৭৮ খ্রি.) থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, পাঁচ শতকে উত্তর বাংলা ছিল পুরোপুরিভাবে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অত্র অঞ্চলে গুপ্ত প্রাদেশিক শাসনের কেন্দ্রস্থল ছিল পুন্ড্রনগর (মহাস্থান)। এখানে গুপ্তদের সুনিয়ন্ত্রিত ও সুবিন্যস্ত শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। গুপ্ত যুগে বাংলার প্রাদেশিক রাজধানী ছিলো পুণ্ড্রনগর। বাংলার প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে গুপ্ত যুগেরই সর্বোচ্চ লিপিতাত্ত্বিক সূত্র পাওয়া যায়। সুসুনিয়া গিরিলিপি, সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি, প্রথম কুমারগুপ্তের বৈগ্রাম, ধনাইদহ, দামোদরপুর, সুলতানপুর ও জগদীশপুর তাম্রশাসন, বুধগুপ্তের দামোদরপুর তাম্রশাসন ও পাহাড়পুর তাম্রশাসন এর পাশাপাশি প্রাপ্ত গুপ্ত মুদ্রাগুলো থেকেও এ সময়ের ইতিহাস নির্মাণ করা যায়। এসব লিপিতাত্ত্বিক সূত্র থেকে সহজেই প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা লাভকরা যায়। সম্রাট প্রথম কুমারগুপ্ত, সম্রাট বুধগুপ্ত, সম্রাট বিষ্ণুগুপ্ত প্রমুখের তাম্রশাসনগুলো বাংলার গুপ্ত শাসন আমলের রাজনৈতিক ইতিহাস বিনির্মাণের কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছে। গুপ্ত শাসনামলে বাংলায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চূড়ান্ত বিকাশ লক্ষ করা যায়।

খ্রিস্টীয় ৪ থেকে ৭ শতক পর্যন্ত গুপ্ত সম্রাটরা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল শাসন করেন যে সময়ের বাংলার বিভিন্ন প্রত্নস্থল থেকে প্রচুর গুপ্ত-স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে বাংলা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ। ভারতের ইতিহাসে গুপ্ত যুগ সামগ্রিকভাবে ‘স্বর্ণযুগ’ হিসেবে খ্যাত। এ সময়ে প্রজাহিতৈষী কেন্দ্রীয় শাসনের আওতায় যে শান্তি, সম্পদ ও সমৃদ্ধির প্রকাশ ঘটে সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে বাংলা তার সুফল ভোগ করে। বাংলা সর্বভারতীয় বাণিজ্যেরও অংশীদার হয়। গুপ্ত যুগে বাংলায় স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার সর্বব্যাপী প্রচলন হয়। স্বর্ণ মুদ্রার বহুল প্রচলন বাংলার আর্থিক সমৃদ্ধির পরিচায়ক। সুপারি, রেশম, তুলা, নারিকেল, লবণ, চিনি ইত্যাদি বাংলা থেকে রপ্তানি হতো। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চীনের সঙ্গে এসময় বাংলার ছিল বাণিজ্যিক সংযোগ। বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে প্রচুর পরিমাণে গুপ্ত-অনুকরণ মুদ্রা পাওয়া যায়, যা থেকে বোঝা যায় বাংলা মুদ্রা অর্থনীতির সুফল ভোগ করেছে।

সমুদ্রগুপ্তের স্বর্ণমুদ্রা

• গুপ্ত পরবর্তীকালীন রাজনৈতিক অবস্থা ও মৎস্যন্যায়:

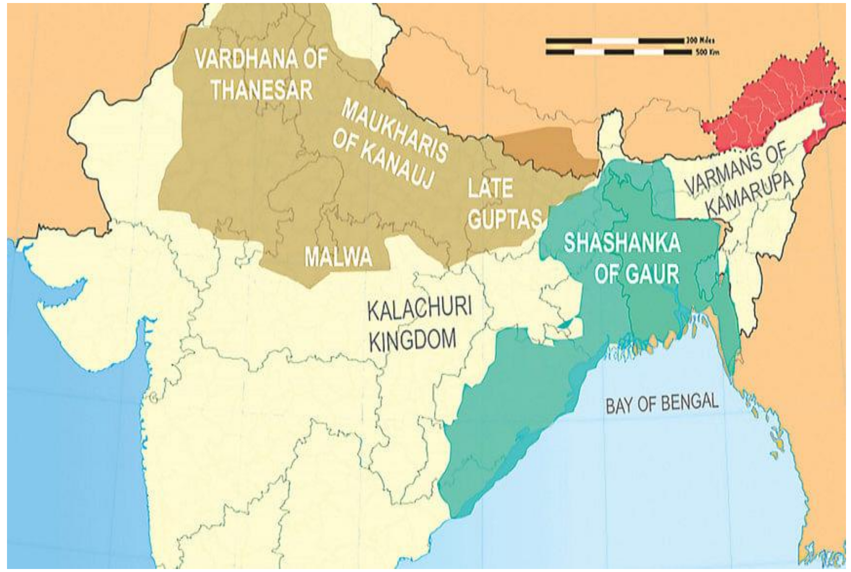

ষষ্ঠ শতকের শেষ দিকে উত্তর ভারতকেন্দ্রিক গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হয়। কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে কেন্দ্র থেকে দূরের রাজ্যগুলো তখন আবারও স্বাধীন হতে শুরু করে। এই সময় ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের মতো পূর্বাংশ তথা বাংলা অঞ্চলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসত্তা গড়ে ওঠার খবর পাওয়া যায়। বঙ্গ তেমনই একটি রাজ্যসত্তা হিসেবে বিকশিত হয়েছিল। বঙ্গ রাজ্যের উত্থান হয়েছিল গোপচন্দ্র নামে একজন শাসকের হাত ধরে ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় দশকে। রাজ্যটির কেন্দ্রস্থল ছিল বর্তমান বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়ায়। বঙ্গ রাজ্যের সীমানা বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা, ফরিদপুর, যশোরের বৃহত্তর এলাকা এবং বর্তমান ভারতের পশ্চিম বাংলার দক্ষিণাংশব্যাপী বিস্তৃত হয়েছিল বলে ইতিহাসবিদ বিএন মুখার্জী গবেষণা করে জানিয়েছেন।

গৌড় নামে আরেকটি রাজ্যসত্তার উত্থান ঘটেছিল সপ্তম শতকের শুরুর দিকে রাজা শশাঙ্কের হাত ধরে। গৌড় রাজ্যের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ যা এখন বর্তমান ভারতের পশ্চিম বাংলা প্রদেশের মুর্শিদাবাদ জেলায় খুঁজে পাওয়া যাবে। এই গৌড় রাজ্যসভার অন্তর্ভুক্ত ছিল বাংলা অঞ্চলের উত্তরাংশ এবং পশ্চিমাংশের বিস্তৃত এক এলাকা; যার মধ্যে ছিল বর্তমান বাংলাদেশের বৃহত্তর রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুরের এলাকাসমূহ এবং বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ এবং বিহারের অংশবিশেষ। তিনি মগধ, উৎকল ও কঙ্গোদের দিকেও অভিযান চালিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন প্রাচীন বাংলার প্রথম সার্বভৌম ও সাম্রাজ্যবাদী শাসক।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল বাংলা অঞ্চলে শক্তিশালী কোনো শাসক ছিলেন না। এর ফলে বাংলায় বহিঃশক্তির আক্রমণ শুরু হয়। বাংলার অভ্যন্তরেও সামন্তরাজারা একে অন্যকে হত্যা করে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের লড়াইয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। এর ফলে এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। প্রায় একশ বছর ধরে (৬৫০-৭৫০) চলমান এই অরাজকতা ইতিহাসে 'মাৎস্যন্যায়' নামে পরিচিত। পুকুরে বড়ো মাছ ছোটো মাছকে ধরে গিলে ফেলার মতো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে বলে মাৎস্যন্যায়। শব্দটি প্রথম কৌটিল্য তাঁর 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে ব্যবহার করেছিলেন।

• পাল শাসনামলে বাংলা

হুন আক্রমণে শক্তিশালী গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার পর বাংলার সভ্যতার ইতিহাসে একটি মারাত্মক অরাজকতার মুখে পড়ে। বস্তুত শতবর্ষব্যাপী অবক্ষয়ের (মৎস্যন্যায়) অবসানে আনুমানিক অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা পুনরায় সংগঠিত হয়। পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল আনুমানিক ৭৫৬ সালে এই অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন পাল রাজবংশ। ইতিহাসবিদদের অনুমান, খুব সম্ভবত ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে গোপাল জনগণের রাজা নির্বাচিত হয়েছিলেন। তবে অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে রাজশক্তির স্থায়িত্ব ও শক্তিশালী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলার ইতিহাসে এটি একটি যুগান্তকারী ঘটনা। পরবর্তীকালে অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে ধর্মপাল ও দেবপালের যোগ্য নেতৃত্ব এই সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত বিকাশের পথ সুগম করে। এরপর পাল রাজগণ প্রায় চারশ বছর ধরে বাংলা শাসন করেছিলেন।

পাল বংশের শাসকদের মধ্যে ধর্মপাল (৭৮১-৮২১), দেবপাল (৮২১-৮৬১), প্রথম মহীপাল এবং রামপালের (১০৮২-১১২৪) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গোপালের মৃত্যুর পর ৭৮১ সালে তাঁর পুত্র ধর্মপাল ক্ষমতায় আরোহণ করেন। পাল বংশের অন্যতম ক্ষমতাধর রাজা বলা হয় তাঁকে। ধর্মপালের রাজত্বকালে পাল বংশ এতই ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে যে, উত্তর ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশ এবং রাজপুতনার গুর্জরপ্রতিহার বংশের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। ক্ষমতা প্রদর্শন ও আধিপত্য বিস্তারের এই লড়াই ইতিহাসে 'ত্রিশক্তির সংঘর্ষ' নামে পরিচিত। এই সংঘর্ষের প্রথম পর্যায়ে ধর্মপাল প্রতিপক্ষের উভয়ের কাছেই পরাজিত হলেও পরে কিছুকালের জন্য বারাণসী এবং প্রয়াগ দখল করে গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী এলাকা পর্যন্ত বাংলার রাজ্য সীমানা বিস্তৃত করেন। তিনি নেপাল জয় করেন। ভাগলপুরের নিকট বিক্রমাশূল বিহার, পাহাড়পুরে সোমপুর বিহার তিনি নির্মাণ করেন। ধর্মপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দেবপাল ক্ষমতায় বসেন। দেবপালের সময়েই পাল বংশের রাজ্যসীমা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এবং মুঙ্গেরে রাজধানী স্থাপিত হয়েছিলো।

দেবপালের মৃত্যুর পর পাল বংশের আধিপত্য ক্রমে কমে আসতে থাকে এবং তাঁদের রাজ্যসীমাও হ্রাস পেতে শুরু করে। এমনই এক দুর্বল শাসকের সময়ে বাংলার উত্তরাংশে বরেন্দ্র এলাকায় কৈবর্তদের একটি বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। কৈবর্ত শব্দের মানে হচ্ছে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়) মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের নেতা দিব্যোক ছিলেন একজন সামন্ত জমিদার। দিব্যোকের নেতৃত্বে পাল বংশীয় রাজা দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করে বরেন্দ্র এলাকায় কৈবর্ত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার ইতিহাসে এই কৈবর্ত বিদ্রোহ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বলে বিবেচিত হয়। এই সময়েই প্রথম রাজশক্তির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে অস্ত্র ধারণ করতে দেখা যায়। অন্যান্য সামন্ত শক্তির সমর্থন থাকলেও দিব্যোক মূলত মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়েই বরেন্দ্র দখল করেছিলেন। পরবর্তীতে রামপাল পুনরায় বরেন্দ্র দখল করেন। তিনিই পাল বংশের সর্বশেষ শক্তিশালী রাজা ছিলেন। এরপর মদনপালের সময় পাল বংশের পতন ঘটে।

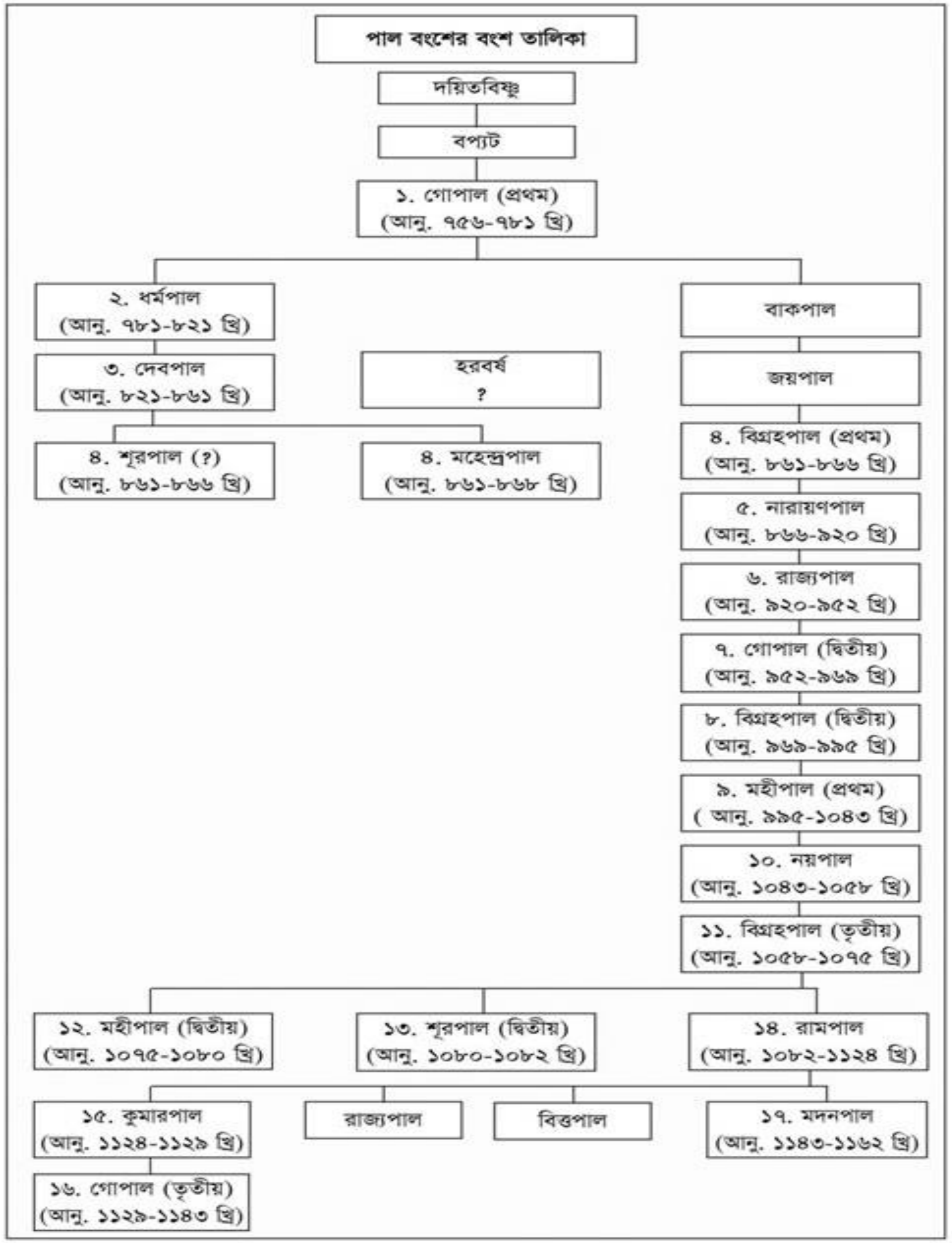

পাল বংশের বংশ তালিকা
দয়িতবিষ্ণু
বপ্যট
১. গোপাল (প্রথম) (আনু. ৭৫৬-৭৮১ খ্রি)
২. ধর্মপাল (আনু. ৭৮১-৮২১ খ্রি)
৩. দেবপাল (আনু. ৮২১-৮৬১ খ্রি)
হরবর্ষ ?
বাকপাল
জয়পাল
৪. শূরপাল (?) (আনু. ৮৬১-৮৬৬ খ্রি)
৪. মহেন্দ্রপাল (আনু. ৮৬১-৮৬৮ খ্রি)
৪. বিগ্রহপাল (প্রথম) (আনু. ৮৬১-৮৬৬ খ্রি)
৫. নারায়ণপাল (আনু. ৮৬৬-৯২০ খ্রি)
৬. রাজ্যপাল (আনু. ৯২০-৯৫২ খ্রি)
৭. গোপাল (দ্বিতীয়) (আনু. ৯৫২-৯৬৯ খ্রি)
৮. বিগ্রহপাল (দ্বিতীয়) (আনু. ৯৬৯-৯৯৫ খ্রি)
৯. মহীপাল (প্রথম) (আনু. ৯৯৫-১০৪৩ খ্রি)
১০. নয়পাল (আনু. ১০৪৩-১০৫৮ খ্রি)
১১. বিগ্রহপাল (তৃতীয়) (আনু. ১০৫৮-১০৭৫ খ্রি)
১২. মহীপাল (দ্বিতীয়) (আনু. ১০৭৫-১০৮০ খ্রি)
১৩. শূরপাল (দ্বিতীয়) (আনু. ১০৮০-১০৮২ খ্রি)
১৪. রামপাল (আনু. ১০৮২-১১২৪ খ্রি)
১৫. কুমারপাল (আনু. ১১২৪-১১২৯ খ্রি)
রাজ্যপাল
বিত্তপাল
১৭. মদনপাল (আনু. ১১৪৩-১১৬২ খ্রি)
১৬. গোপাল (তৃতীয়) (আনু. ১১২৯-১১৪৩ খ্রি)

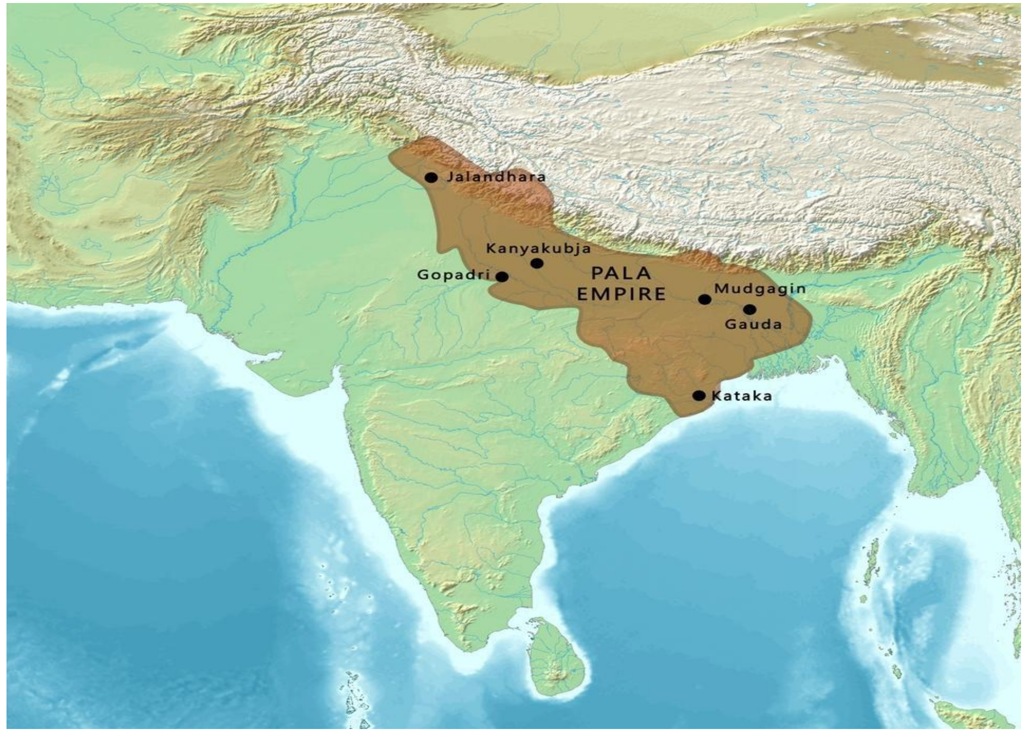

Jalandhara
Kanyakubja
Gopadri
PALA EMPIRE
Mudgagin
Gauda
Kataka

• সেন রাজাদের রাজনীতি ও ক্ষমতাবলয় (১০৬১-১২০৪)

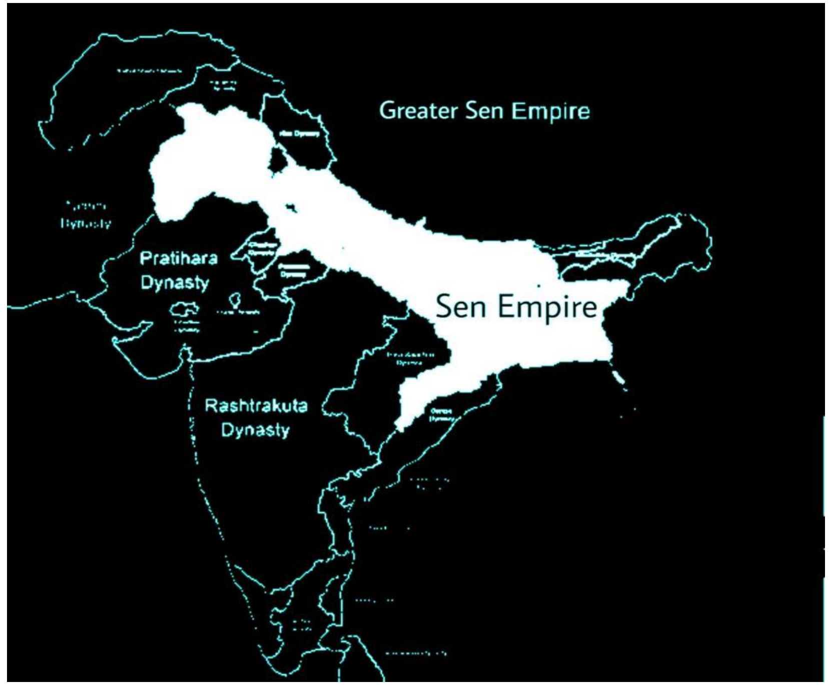

একাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে আঞ্চলিক বাংলার একটি অংশে (রাঢ় এবং গৌড়) সেন রাজবংশের উত্থান ঘটে। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সামন্ত সেন। সেন রাজাদের আদি নিবাস ছিল দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট। বরেন্দ্র পুনরুদ্ধারে যারা সৈন্য ও অস্ত্র দিয়ে রামপালকে সহায়তা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন বিজয় সেন। রামপালের মৃত্যুর পর পাল রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে বিজয় সেন বাংলার কিছু অংশ দখল করে নেন। বিজয় সেন একদিকে পাল বংশের রাজা মদনপালকে পরাজিত করে বাংলার উত্তর-পশ্চিম অংশ এবং অন্যদিকে বর্ম রাজাকে পরাজিত করে দক্ষিণ-পূর্ব অংশ দখল করে নেন। এছাড়াও কামরূপ, কলিঙ্গ, মিথিলা আক্রমণসহ নানান স্থানে তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং ক্রমেই আঞ্চলিক বাংলার প্রায় সবটুকু অংশের উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব অংশ জয় করার পর বিজয় সেন বিক্রমপুরে (বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলা) সেন রাজবংশের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন।

বিজয় সেনের পর তাঁর পুত্র বল্লাল সেন(১১৬০-১১৭৮) এবং লক্ষণ সেন (১১৭৮-১২০৪) বংশানুক্রমে সিংহাসন অধিকার করেন। শাসক হিসেবে শক্তিশালী হওয়ার পাশাপাশি কবি ও পণ্ডিত হিসেবেও বল্লাল সেনের খ্যাতি ছিল। তিনি পাঁচটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ব্রতসাগর, আচারসাগর ও প্রতিষ্ঠাসাগর। তবে অদ্ভুদসাগর এর রচনাকাজ তিনি জীবদ্দশায় শেষ করতে পারেননি। পরে তাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেন এর কাজ শেষ করেন। বঙ্গীয় কুলজি গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রথার বিস্তার ঘটিয়েছিলেন। বল্লাল সেনের সময় বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম অনেক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করায় সমাজে নতুন করে শ্রেণিভেদ প্রথার শেকড় গ্রোথিত হয়। উচ্চশ্রেণির ব্রাহ্মণরা নিম্নশ্রেণির মানুষকে ধর্মীয় আধিপত্যের দোহাই দিয়ে বিভিন্ন নিয়মনীতি ও আইন কানুনের শিকলে বেঁধে ফেলে। তারা নিম্নবর্ণের জনগোষ্ঠীকে শোষণ ও অত্যাচার শুরু করে। শেষ জীবনে সিংহাসন ত্যাগ করে পুত্র লক্ষ্মণ সেনকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে বল্লালসেন নির্জনপুর চলে যান।

Coins of Sena Dynasty

বল্লাল সেনের পর বাংলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন লক্ষ্মণ সেন। পিতার যোগ্য উত্তরসূরী লক্ষণ সেনের দক্ষতা ও রণকৌশলের গুণেই সেন রাজত্ব উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল। আবার এই লক্ষণ সেনের শাসনামলেই সেন শাসনামলের পতন ঘট। ত্রয়োদশ শতকের শুরু এবং লক্ষণ সেনের শাসনকালের শেষদিকে তুর্কি-আফগান যোদ্ধা বখতিয়ার খলজি ভারতবর্ষের পূর্বদিকে আক্রমণ পরিচালনা করে সেন সাম্রাজ্যে ভাঙনের সূচনা ঘটান। সেনদের ক্ষমতা বর্তমান বাংলাদেশের বিক্রমপুরে সীমিত হয়ে পড়ে আর বাংলা অঞ্চলের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কিছু অংশ (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের অংশবিশেষ) তুর্কি খলজিদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়

• মুসলিম বিজয়: বখতিয়ার খলজি থেকে ইওজ খলজি (১২০৪-১২২৭)

বাংলা অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিমাংশে তুর্কি-আফগান যোদ্ধা ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজির হাত ধরে নতুন এক রাজনীতি আর ক্ষমতা বিস্তারের ইতিহাস গড়ে ওঠে। বখতিয়ার খলজি ছিলেন জাতিতে তুর্কি, এবং আফগানিস্তানের গরমসির এলাকার অধিবাসী। অযোধ্যার শাসনকর্তা হুসামউদ্দীনের অধীনে ভারতের উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর জেলায় ডিউলী ও ভাগত নামের দুটি পরগনার জায়গির লাভ করেন। ভিউলী এবং ভাগতে বসেই বখতিয়ার কিছু সৈন্য সংগ্রহ করে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেন। এরপর পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ও জমিদারি এলাকায় আকস্মিক আক্রমণের মধ্য দিয়ে মগধ(বিহার) পর্যন্ত অগ্রসর হন। আকস্মিক আক্রমণের নীতি অনুসরণ করেই বখতিয়ার একদিন গোপনে প্রস্তুতি ও খোঁজখবর নিয়ে ঝাড়খন্ডের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সেন রাজার প্রাসাদ অভিমুখে সৈন্য পরিচালনা করেন। ঝাড়খন্ডের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বখতিয়ার এত দ্রুত সৈন্য পরিচালনা করেন যে তাঁর সঙ্গে মাত্র সতেরো-আঠারোজন সৈন্য রাজপ্রাসাদে পৌঁছাতে পেরেছিলেন।

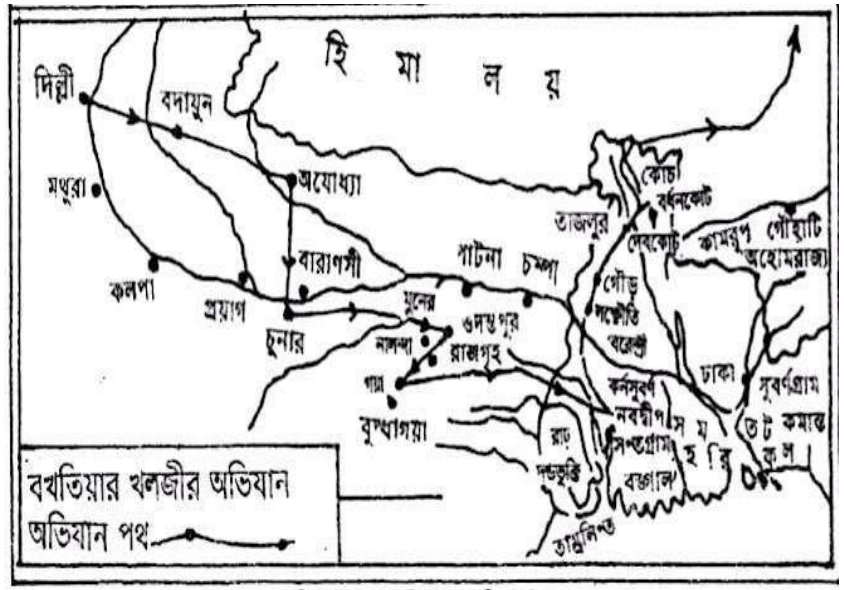

ছবি ঃ বাংলায় বখতিয়ার খলজীর অভিযান

এভাবেই বখতিয়ার খলজি বাংলা অঞ্চলের একটি অংশ নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিলেন। রাজা লক্ষণ সেনকে বিক্রমপুরের রাজধানীতে ফিরে যেতে বাধ্য করে প্রতিষ্ঠা করেন খলজি বংশের শাসন। লখনৌতিতে স্থাপিত হয় তাঁদের রাজধানী। এরপর তিনি তিব্বতের দিকে পরবর্তী অভিযান পরিচালনা করেন এবং মৃত্যুমুখে পতিত হন। এরপর বখতিয়ারের সেনাপতি আলী মর্দান খলজি লখনৌতির সিংহাসন নিয়ন্ত্রণে নেন। আলী মর্দানের সঙ্গে ক্ষমতার ভাগ নিয়ে বখতিয়ারের 'অপর দুই সেনাপতি শীরান খলজি এবং গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজির বিবাদ শুরু হয়। ত্রিপক্ষীয় এই দ্বন্দ্বে শীরান এবং মর্দান দুজনেই নিহত হন। লখনৌতির ক্ষমতায় বসেন গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজি। তিনি দিল্লির মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নিজের নামে খুতবা পাঠ ও মুদ্রা জারি করেন। ১২১২ থেকে ১২২৭ পর্যন্ত প্রায় ১৫ বছর লখনৌতি শাসন করেন সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজি। ১২২৭ সালের দিকে দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিশের পুত্র নাসিরউদ্দীন লখনৌতি আক্রমণ করেন। ইওজ খলজি তা প্রতিহত করতে দ্রুত ছুটে যান লখনৌতির দিকে। সেখানে গিয়ে তিনি দিল্লির সৈন্যদের হাতে ধরা পড়েন ও সপরিবার নিহত হন।

গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজির সময়ের স্বর্ণমুদ্রা

বাংলায় তুর্কী শাসন (১২২৭-১২৮৭)

ইওজ খলজির মৃত্যুর পর ভারতের তৎকালীন অন্যান্য বহু আঞ্চলিক রাজ্যের মতো লখনৌতি রাজ্য দীর্ঘকালের জন্য দিল্লির শাসকদের অধীনে চলে যায়। লখনৌতির শাসনকর্তা প্রেরিত হয় দিল্লি থেকে। দিল্লির সুলতানের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে শাসনকাজ পরিচালনা করতেন লখনৌতির শাসকেরা। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন দিল্লির শাসকদের ক্রীতদাস। এজন্য এই সময়কে অনেকে 'দাস শাসন' বা 'মামলুক শাসন' বলেও অভিহিত করে থাকেন। এই সময়ের বেশ কয়েকজন উল্লেখযোগ্য গভর্নর ছিলেন তুগরল তুগান খান, তমর খান, জালালউদ্দিন মাসুদজানি, মুগিসউদ্দিন ইউজবক, ইজ্জুদ্দিন বলবন, আমীন খান, মুইজউদ্দিন তুঘরিল খান (স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং গিয়াসউদ্দিন বলবন এর নিকট পরাজয় বরণ করেন ১২৮১ সালে) এরপর লখনৌতির গভর্নর হোন বুঘরা খান। ১২৮৭ সালে গিয়াসউদ্দিন বলবন মারা যান। তার মৃত্যুর পর বুঘরা খান ১২৯০ পর্যন্ত নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ নাম গ্রহণ করে স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করেন।

বাংলায় স্বাধীন বলবনী শাসন, তুঘলক-পূর্ব ও তুঘলক শাসন (১২৯০-১৩৩৮ খ্রি.)

নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ ১২৯০ পর্যন্ত বাংলা শাসন করেন। তাঁর ছেলে বুকনউদ্দীন কায়কাউস (১২৯০–১৩০১ খ্রি.) বাংলা ও বিহারের শাসক হন। পরে শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৩০১–১৩২২ খ্রি.) লখনৌতির শাসনভার গ্রহণ করে বিহার, পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা দখল করে রাজ্য বিস্তার করেন। তিনি সাতগাঁও, সোনারগাঁও, ময়মনসিংহ, ও সিলেট (১৩০৩ খ্রি.) জয় করেন এবং সোনারগাঁও টাকশাল হতে মুদ্রা চালু করেন। তার মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেদের মধ্যে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। তার এক ছেলে গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর ক্ষমতায় বসলে তার আরেক ছেলে নাসিরউদ্দিন সিংহাসনে আরোহনের জন্য দিল্লির সাহায্য কামনা করেন। দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক (১৩২০–১৩২৫ খ্রি.) বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে ১৩২৪ খ্রিষ্টাব্দে অভিযান পাঠান, যার ফলে বাহাদুর পরাজিত ও বন্দি হন এবং বাংলা দিল্লির অধীনে চলে যায়।

গিয়াসউদ্দিন তুঘলক বাংলা জয় করে প্রশাসনিকভাবে দেশকে তিন ভাগে ভাগ করেন: (১) লখনৌতি (নাসিরউদ্দিন ইব্রাহিম), (২) সাতগাঁও ও (৩) সোনারগাঁও (বাহরাম খান)। তুঘলকের মৃত্যুর (১৩২৫ খ্রি.) পর তাঁর পুত্র মুহাম্মদ বিন তুঘলক দিল্লির সিংহাসনে বসেন এবং প্রশাসনে পরিবর্তন আনেন।

সোনারগাঁওয়ে বাহরাম খানের সাথে গিয়াসউদ্দিন বাহাদুরকে যুগ্ম শাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন। কদর খানকে লখনৌতি ও ইজ্জুদ্দিন ইয়াহিয়াকে সাতগাঁও এর শাসক নিযুক্ত করেন।

ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ (১৩৩৮-১৩৪৯)

১৩২৮ থেকে ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ড দশ বছর কদম খান লখনৌতি, ইজ্জতউদ্দিন ইয়াহিয়া সাতগাঁও এবং বাহরাম খান সোনারগাঁও শাসন করেন। ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তা বাহরাম খান মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তার বর্মরক্ষক ফখরা নিজেকে সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ উপাধি ধারণ করে সোনারগাঁও-এর স্বাধীনতা ঘোষণা করে ক্ষমতা দখল করেন। এটি অত্যন্ত অবিশ্বাস্য ঘটনার জন্ম দেয়। তিনি চট্টগ্রাম জয় করেন এবং চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত 'হদ্দিনের পথ' নির্মাণের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের রাজত্বকালে সুদূর আফ্রিকার মরক্কো থেকে ইবনে বতুতা নামে একজন মুসলিম পর্যটক ১৩৪৫-৪৬ খ্রি. বাংলায় অসেন। তাঁর 'রেহেলা-ই-ইবনে বতুতা' নামক ভ্রমণ বিবরণীতে সমসাময়িক বাংলায় আর্থ-সামাজিক অবস্থার অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়

ইলিয়াস শাহী শাসন: (১৩৪২-১৪১৪), (১৪৩৫-১৪৮৭)

লখনৌতির শাসক আলাউদ্দিন আলী শাহকে হত্যা করে ১৩৪২ সালে লখনৌতির ক্ষমতায় বসেন শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ, প্রথমে লখনৌতির দক্ষিণের শাসনকেন্দ্র সাতগাঁ নিয়ন্ত্রণে নেন (১৩৪৬)। এরপর নেপাল ও ত্রিহুত আক্রমণ করে প্রচুর ধনসম্পদ সংগ্রহ করেন। ১৩৫২ সালে ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁ আক্রমণ করেন এবং গাজি শাহকে পরাজিত করে সোনারগাঁ দখল করে নেন। তিনটি প্রশাসনিক কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে ইলিয়াস শাহ বাংলার প্রায় সিংহভাগ জায়গা তাঁর শাসনাধীনে নিয়ে আনতে সক্ষম হন। দিল্লির মুসলমান সুলতান ফিরোজ শাহ তুগলক বাংলার মুসলমান সুলতান ইলিয়াস শাহকে উচ্ছেদ করার জন্য বিশাল সৈন্যবহর নিয়ে অভিযান পরিচালনা করেন। ইলিয়াস শাহ সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে একডালা নামে একটি দুর্গে আশ্রয় নেন। বাংলার বৈরী আবহাওয়া, বর্ষার জল, জঙ্গল ও মশার উপদ্রবে দিল্লির সৈন্যরা বেশি দিন টিকতে পারেননি। ফিরোজ শাহ তুগলক বাধ্য হয়েই দিল্লি ফিরে যান।

দিল্লির দরবারি ঘটনাপঞ্জি লেখক শামস-ই-সিরাজ আফীফ তাঁর লেখা একটি গ্রন্থে ইলিয়াস শাহকে 'শাহ-ই বাঙ্গালাহ', 'শাহ-ই-বাঙ্গালীয়ান' এবং 'সুলতানই বাঙ্গালাহ' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি ১৩৫৮ পর্যন্ত শাসন করেন। এরপর ক্ষমতায় আসেন তার পুত্র সেকান্দর শাহ (১৩৫৮-১৩৯৩)। তাঁর রাজত্বকালে কোন রাজ্যবিস্তার না হলেও তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত রাজ্যের সীমানা অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হন। তাঁর সময় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। তাঁর রাজত্বকালের স্থাপত্য নিদর্শনের মধ্যে পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদ দিনাজপুরের মোল্লা আতার মসজিদ এর নাম উল্লেখযোগ্য।

এরপর ক্ষমতায় আরোহন করেন গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ (১৩৯৩-১৪১১)। মধ্যযুগীয় বাংলার ইতিহাসে যে সকল শাসক শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে এবং বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে উদার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন তাঁদের মধ্যে সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ অন্যতম। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভকরে শাহ মুহাম্মদ সগীর ইউসুফ জুলেখা কাব্য রচনা করেন। অনেক ঐতিহাসিক বলেন যে, তিনি বাংলা ভাষায় রামায়ণের রচিয়তা কৃত্তিবাসেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আজম শাহের শাসনামলে পান্ডুয়া ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল বলে জানা যায়। তিনি পারস্যের কবি হাফিজের সাথে পত্রালাপ করতেন।

ইলিয়াসশাহী বংশের প্রথম পর্বের পরে রাজা গণেশ একজন হিন্দু জমিদার হিসেবে ক্ষমতায় ওঠেন। তিনি ১৪১৪-১৪১৮ পর্যন্ত শাসন করেন। তার পুত্রজালালউদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৪১৫–১৪৩৩) দক্ষ শাসক হিসেবে খ্যাত। তিনি রাজধানী গৌড়ে স্থানান্তর করেন এবং বিস্তৃত এলাকা শাসন করেন। তার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারদের মধ্যে আর কোন শক্তিশালী শাসকের উত্থান হয়নি ফলে বাংলার শাসন আবার ইলিয়াস শাহীদের হস্তগত হয়।

পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনামলে (১৪৩৫-১৪৮৭) উল্লেখযোগ্য শাসক ছিলেন নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ ও সুলতান রোকনুদ্দিন বারবক শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪)। পরবর্তী ইলিয়াস শাহী সুলতানেরাও অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দেন এবং পূর্ববর্তীদের মত উদারতা, শাসন দক্ষতা ও উত্তম চরিত্রের পরিচয় দেন। শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং স্থাপত্য শিল্পে তাঁরা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

এরপর ৬ বছরের জন্য বাংলা শাসন করে হাবশি শাসকরা (১৪৮৭-১৪৯৩)।

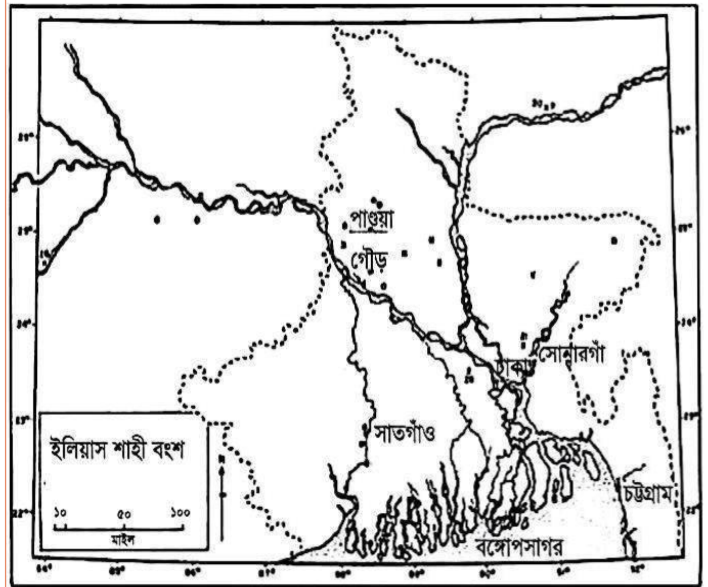

ইলিয়াস শাহী বংশ

পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদ

হুসেনশাহী আমলে বাংলা (১৪৯৩-১৫৩৮):

মধ্যযুগের সুলতানি শাসন আমলে ইলিয়াস শাহী শাসনের সমাপ্তির পর হোসেনশাহী রাজ বংশের উত্থান বাংলার ইতিহাসের একটি অনন্য অধ্যায়। হাবশি শাসকদের হটিয়ে সৈয়দ বংশীয় আলাউদ্দিন হোসেন শাহ কর্তৃক এ রাজ বংশের শাসনের সূচনা হয়েছিল। এ বংশের ৪ জন শাসক প্রায় ৪৫ বছর (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রি.) বঙ্গদেশ শাসন করেন। তাঁদের শাসনকালে বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি, কৃষি-শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়। হোসেন শাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এ রাজবংশটি প্রায় ৪৫ বছর বাংলা শাসন করে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে মধ্যযুগীয় বাংলাকে উন্নতির শীর্ষে নিয়ে গিয়েছিল।

হাবশি সুলতান মুজাফফর শাহকে পরাজিত করে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ক্ষমতায় আরোহন করেন। তিনি রাজধানী গৌড় থেকে একডালায় স্থানান্তর করেন। রাজ্যের নিরাপত্তা ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করে হোসেন শাহ রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। তাঁর সময়ে বাংলার রাজ্যসীমা সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায়। তিনি রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের কামতা ও কামরূপ অভিযান করেন এবং দখল করেন। তিনি উড়িষ্যা ও ত্রিপুরায় অভিযান চালিয়েও সফলতা অর্জন করেন।

সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের শাসনকালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে নবযুগের সূচনা হয়। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় কৃত্তিবাস 'রামায়ণ' ও মালাধর বসু 'ভগবদ গীতা' বাংলায় অনুবাদ করেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর 'মহাভারত' অনুবাদ করেন। মনসামঙ্গল কাব্যের বিজয় গুপ্ত ও বিপ্রদাসও তাঁর সহযোগিতা পান। হোসেন শাহ গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ, নাচাইল মসজিদ, গোমতি ফটকসহ বহু স্থাপত্য নির্মাণ করেন। তিনি 'বাদশাহী সড়ক'সহ বহু রাস্তা নির্মাণ করেন। ১৫১৯ সালে মৃত্যুবরণ করা হোসেন শাহ ছিলেন মধ্যযুগীয় বাংলার শ্রেষ্ঠ শাসকদের একজন।

তার পর ক্ষমতায় আরোহন করেন নাসিরুদ্দিন নুসরত শাহ (১৫১৯-১৫৩২)। গৌড়ের কদম রসুল দুর্গ, বড় সোনা মসজিদ, বারদুয়ারি মসজিদ তার কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে। হোসেনশাহী বংশের শেষ শাসক ছিলেন গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৫৩৩-১৫৩৮)

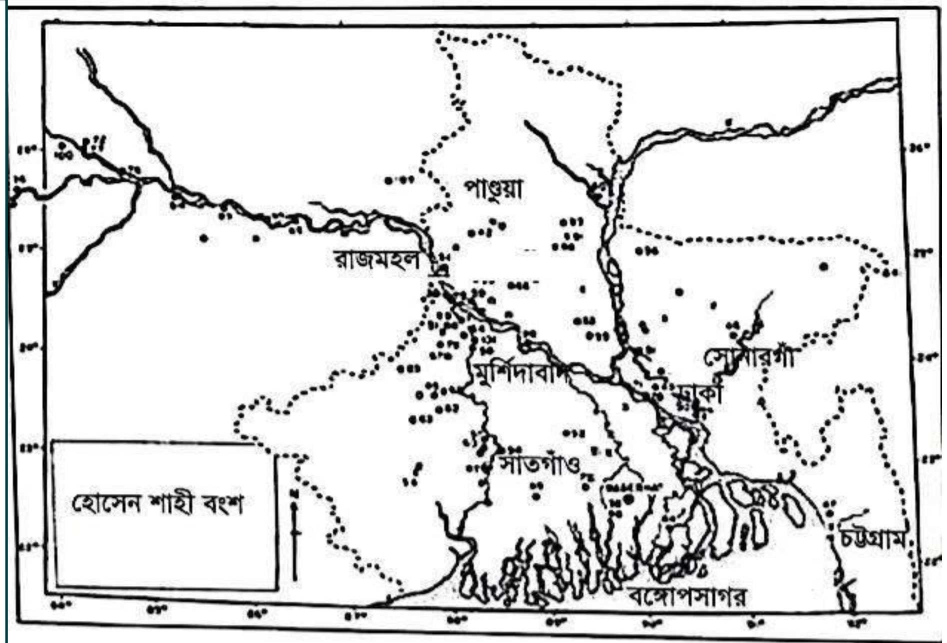

হোসেন শাহী বংশ

বড় সোনা মসজিদ

আফগান শাসনামলে বাংলা (১৫৩৮-১৫৭৬)

বাংলায় আফগান শাসন শুরু করেন শের খান শুর। তিনি ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে দু'বার বাংলার রাজধানী গৌড় আক্রমণ করেন। এতে সতর্ক হয়ে মুঘল সম্রাট হুমায়ুন শের খানের পিছু ধাওয়া করে বাংলার রাজধানী গৌড় অধিকার করে নেন। গৌড়ের চমৎকার প্রাসাদ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে হুমায়ুন এর নামকরণ করেন 'জান্নাতাবাদ'। সম্রাট গৌড়ে ৬ মাস আমোদ ফূর্তিতে গা ভাসিয়ে দেন। এ সুযোগে শের খান নিজের শক্তি বাড়াতে থাকেন। দিল্লি থেকে খবর আসে হুমায়ুনের সৎভাই হিন্দাল সিংহাসন দখল করার ষড়যন্ত্র করছেন। এ খবর পেয়ে হুমায়ুন দিল্লির দিকে যাত্রা করেন। গঙ্গা নদীর তীরে চৌসায় হুমায়ুন পৌছালে শের খান তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। অপ্রস্তুত হুমায়ুন পরাজিত হন (১৫৩৯ খ্রি.)। মুঘল সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজিত করে শের খান 'শের শাহ' উপাধি নেন। তিনি বিহারে নিজেকে স্বাধীন সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন। এরপর তিনি বাংলার দিকে দৃষ্টি দেন। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে মুঘল শাসনকর্তা আলী কুলিকে পরাজিত করে তিনি বাংলা দখল করেন। এ বছরই তিনি হুমায়ুনকে কনৌজের নিকট বিলগ্রামের যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসন অধিকার করেন। এর ফলে দীর্ঘদিন পর বাংলা আবার দিল্লির শাসনে চলে আসে। চট্টগ্রাম ও সিলেট পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশ শের শাহের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। শের শাহ শুর বংশীয় ছিলেন বলে এ সময়ের বাংলার শাসন শূর আফগান বংশের শাসনকাল হিসেবে পরিচিত। তিনি ৩০০০ মাইল দীর্ঘ সড়ক ই আজম (গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড) নির্মাণ করেন, পাট্টা-কবুলিয়ত চালু করেন, ঘোড়ার ডাকের প্রচলন ঘটান। ১৫৪৫ সালে শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধররা দুর্বল হয়ে পড়ে। সেই দুর্বলতার সুযোগে মুঘলরা তাদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে। দিল্লি ও বাংলায় শূর রাজবংশের পতনের সুযোগে পশতুন রক্তধারার আফগান জাতিভুক্ত কররাণী গোত্রের তাজ খান কররাণী কর্তৃক ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় কররাণী রাজবংশের যাত্রা শুরু হয়। তাজ খান শেরশাহের অধীনে অমাত্য হিসেবে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন শুরু করেন (১৫৬২-১৫৬৪ খ্রি.) এবং পরবর্তীতে মুহম্মদ শাহের পরাজয়ের পর তিনি দক্ষিণ-পূর্ব বিহার ও পশ্চিম বাংলা দখল করে নেন এবং পরবর্তীতে সোনারগাঁ দখল করে রাজধানী হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। তাজ খান কররাণী (১৫৬৪-১৫৬৬ খ্রি.) কর্তৃক এ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হলে পরবর্তীকালে সুলাইমান খান কররাণী (১৫৬৬-১৫৭২ খ্রি.), বায়েজিদ খান কররাণী (১৫৭২-জুন ১৫৭২ খ্রি.), দাউদ খান কররাণী (জুলাই ১৫৭২-১৫৭৬ খ্রি.) কররাণীদের শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সেনাপতি মুনিম খানের আক্রমণে রাজমহলের যুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এ বংশের শাসনের সমাপ্তি ঘটে।

শেরশাহ

দাউদ খান কররানী (বাম) ও মুঘল সেনাপতি মুনিম খান (ডান)

বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা ও বার ভূঁইয়া-মুঘল দ্বন্দ্ব

রাজমহলের যুদ্ধের মাধ্যমে আফগান শাসক দাউদ কররানীকে পরাজিত করার পর মুঘল শাসকরা বাংলা শাসন করার জন্য সুবাদার প্রেরণ করেন। কিন্তু সুবাদারদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব অংশের কয়েকজন শক্তিশালী জমিদার। এই জমিদাররা সংঘবদ্ধ হয়ে মুঘল সুবাদারদের বাধা প্রদান করেন এবং স্বাধীনভাবে নিজ নিজ জমিদারি এলাকা শাসন করতে থাকেন। ইতিহাসে এই জমিদারগণ বার ভূঁইয়া নামে পরিচিত। সম্রাট আকবরের সময় থেকে বাংলায় স্বাধীনভাবে শাসনকৃত ভূঁইয়াদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হলে কিছু সাফল্য এলেও চূড়ান্ত সাফল্য আসেনি। ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবরের মৃত্যু হলে সম্রাট জাহাঙ্গীর সিংহাসনে বসে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে সুবাদার ইসলাম খানকে বাংলা অভিযানে প্রেরণ করেন। ইসলাম খান ঘোড়াঘাট হয়ে প্রবেশ করে স্থানীয় ভূঁইয়াদের নিকট থেকে প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। কিন্তু তিনি কৃতিত্বের সাথে বার ভূঁইয়া নেতা মুসা খান ও তাঁর সহযোগী শক্তিকে পরাজিত ও নির্মূল করতে সক্ষম হয় এবং ক্রমান্বয়ে রাজা প্রতাপাদিত্য, মীর হাম্মীর, সেলিম খান, রাজা সত্যজিৎ, পীতাম্বর রায় এবং সর্বোপরি এঁদের নেতা মুসা খানকে পরাজিত করে বাংলায় মুখল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে আফগান নেতা উসমানকে পরাজিত করে বোকাইনগর দখল করে নেন। মুঘল আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়ে খাজা উসমান পালিয়ে শ্রীহট্টের আফগান ভূঁইয়া বায়েজিদের আশ্রয় গ্রহণ করলে তাঁকে পিছু ধাওয়া করে দৌলাম্বপুরে সংঘটিত যুদ্ধে খাজা উসমানকে পরাজিত ও হত্যা করলে ভূঁইয়াদের শক্তি নিঃশেষ এর চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। এরপর ইসলাম খান ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কয়েকটি অভিযান চালিয়ে সকল ভূঁইয়া ও তাঁদের সহযোগীদের চূড়ান্ত পতন ঘটান।

আকবরের আমলে বার-ভূঞা ঃ

১। ঈসা খান মসনদ-ই-আলী, নেতা।
২। ইবরাহীম নারাল।
৩। করিমদাদ মুসাজাই।
৪। মজলিস দিলাওয়ার।
৫। মজলিস প্রতাপ।
৬। টিলা গাজী।
৭। বাহাদুর গাজী।
৮। চাঁদ গাজী।
৯। সুলতান গাজী।
১০। সেলিম গাজী।
১১। কাসিম গাজী।
১২। কেদার রায়।
১৩। শের খান।

জাহাঙ্গীরের আমলে বার-ভূঞা ঃ

১। মুসা খান মসনদ-ই-আলী, নেতা।
২। আলাওল খান।
৩। আবদুল্লাহ খান।
৪। মাহমুদ খান।
৫। বাহাদুর গাজী।
৬। সোনাগাজী।
৭। আনোয়ার গাজী।
৮। শয়খ পীর।
৯। মিরযা মুমিন।
১০। মাধব রায়।
১১। বিনোদ রায়।
১২। পাহলোয়ান।
১৩। হাজী শামস-উদ-দীন বাগদাদী।

ঈসা খান

ইসলাম খান চিশতি

ফতেহপুর সিক্রির জামে মসজিদের আঙিনায় অবস্থিত ইসলাম খানের সমাধি।

বাংলায় মুঘল সুবাদারি ও নবাবী শাসন (১৫৭৬-১৭৫৭)

মুঘল আমলে বাংলা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সুবা, যেখানে সম্রাটের প্রতিনিধিরা সুবাদার হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর ইসলাম খান চিশতিকে (১৬০৮–১৬১৩) বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন, যিনি বার ভূঁইয়াদের দমন করে ১৬১০ সালে ঢাকাকে রাজধানী ঘোষণা করেন। এরপর কাশিম খান চিশতি (১৬১৩–১৬১৭), ইব্রাহিম খান ফতেহ জঙ্গ (১৬১৭–১৬২৪), দারার খান (১৬২৪–১৬২৫), মহব্বত খান (১৬২৫–১৬২৬), মুকাররম খান (১৬২৬–১৬২৭) ও ফিদাই খান (১৬২৭–১৬২৮) শাসন করেন। সম্রাট শাহজাহান কাসিম খান জুয়িনীকে (১৬২৮–১৬৩২) সুবাদার নিযুক্ত করেন, যিনি পর্তুগিজদের শক্তি দমন করেন। এরপর আজম খান (১৬৩২-১৬৩৫) ও ইসলাম খান মাসহাদী (১৬৩৫–১৬৩৯) দায়িত্ব পালন করেন। শাহজাহানের পুত্র শাহ সুজা (১৬৩৯–১৬৫৯) দীর্ঘ সময় সুবাদার ছিলেন, তবে আওরঙ্গজেবের সঙ্গে উত্তরাধিকার যুদ্ধের ফলে পরাজিত হয়ে আরাকানে পালিয়ে নিহত হন। এরপর মীর জুমলা (১৬৬০–১৬৬৩) সুবাদার হয়ে আহোম ও কুচবিহার অভিযানে নেতৃত্ব দেন। দাউদ খান (১৬৬৩–১৬৬৪) ও দিলির খান (১৬৬৩) অস্থায়ীভাবে শাসন করেন। পরে শায়েস্তা খান (১৬৬৪–১৬৮৮) দীর্ঘ ২৩ বছর সুবাদার ছিলেন এবং মগ ও আরাকানিদের দমন করে বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন, পাশাপাশি স্থাপত্য ও অর্থনীতির অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটান। তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধেও কঠোর অবস্থান নেন। তাঁর পর খান-ই-জাহান বাহাদুর (১৬৮৮–১৬৮৯), ইব্রাহিম খান (১৬৮৯–১৬৯৮) ও আজিমুদ্দিন (১৬৯৮–১৭১২) সুবাদার হন। ১৭০০ সালে মুর্শিদ কুলী খান প্রথমে দিউয়ান এবং পরে সুবাদার (১৭০০–১৭২৭) হিসেবে নিয়োগ পান। তিনি রাজস্ব ব্যবস্থায় সংস্কার আনেন ও কার্যত স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করেন, যার মাধ্যমে বাংলায় নবাবি শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

সুবাদার শায়েস্তা খান

বাংলায় নবাবি শাসন শুরু হয় মুর্শিদ কুলী খানের (করতলব খান) হাত ধরে, যিনি ১৭০০ সালে দিওয়ান নিযুক্ত হন এবং ১৭১৭ সালে সম্রাট ফারুখসিয়ারের কাছ থেকে সুবাদার পদ লাভ করেন; তাঁর শাসনকাল ছিল ১৭০০–১৭২৭। তিনি রাজধানী ঢাকার পরিবর্তে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন এবং রাজস্ব ব্যবস্থায় মৌলিক সংস্কার এনে মালজামিনি প্রথার প্রবর্তন করেন। এরপর তাঁর জামাতা শুজাউদ্দিন মুহম্মদ খান (১৭২৭–১৭৩৯) ও নাতি সরফরাজ খান (১৭৩৯–১৭৪০) নবাব হন। ১৭৪০ সালে আলীবর্দী খান ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং ১৭৫৬ সাল পর্যন্ত শাসন করেন। তিনি মারাঠা আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং প্রশাসনিক দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর নাতি সিরাজউদ্দৌলা (১৭৫৬–১৭৫৭) নবাব হন, যিনি ইংরেজদের সঙ্গে পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হন। এই যুদ্ধে মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজ নিহত হন এবং মীর জাফর (১৭৫৭–১৭৬০) নবাব হন। পরবর্তীতে মীর কাশিম (১৭৬০–১৭৬৩), মীর জাফরের দ্বিতীয় দফা (১৭৬৩–১৭৬৫) শাসনের পর ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করে এবং নবাবদের কেবল নামমাত্র শাসক করে রাখে। সর্বশেষ নবাব ছিলেন *ফেরাদুন জং মনসুর আলি খান।* এইভাবে বাংলার স্বাধীন নবাবি শাসনের অবসান ঘটে এবং ব্রিটিশ শাসনের সূচনা হয়।

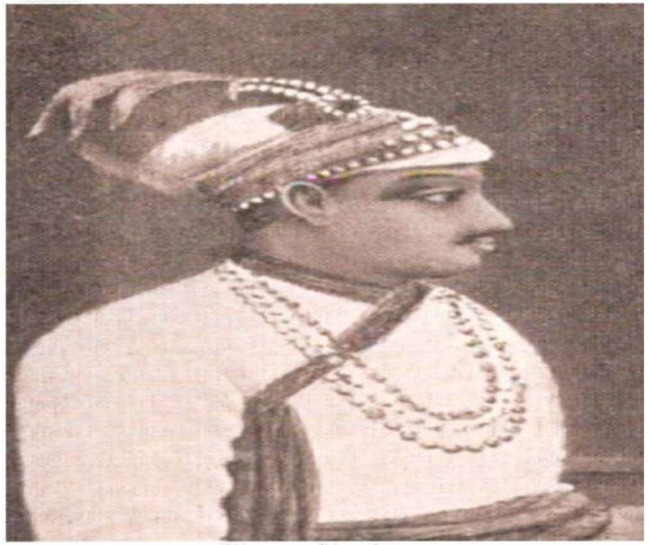

সিরাজউদ্দৌলা

বাংলায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন (১৭৫৭-১৯৪৭)

সুবাদারি শাসনের আগে থেকেই বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের আগমন এবং বাণিজ্য তৎপরতা শুরু হয়। কলকাতা, চুঁচুড়া, চন্দননগর, হুগলী, চট্টগ্রাম, সাতগাঁও প্রভৃতি এলাকা ইংরেজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, পর্তুগিজ, ফরাসি বণিকদের ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠে। বাণিজ্যকেন্দ্র নির্মাণের পাশাপাশি তাদের অনেকেই বাংলায় লুণ্ঠনকাজও পরিচালনা করতেন। এসব অপতৎপরতার কারণে সুবাদার এবং নবাবদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়েই পর্তুগিজ, ফরাসি এবং ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিকদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। বাইরের বণিকদের পাশাপাশি বাংলার অভ্যন্তরেও নবাবি শাসনের আসন দখল নিয়ে অভিজাতদের মধ্যে বিবাদ চলছিল। এরূপ বহুমুখী বিবাদের ফল হিসেবেই ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ঘটে এবং ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার ক্ষমতায় আসীন হয়। ইংরেজ শাসন প্রায় ২০০ বছর স্থায়ী হয় (১৭৫৭-১৮৫৭ -কোম্পানির শাসন, ১৮৫৭-১৯৪৭ -ব্রিটিশ সরকারের শাসন)।

কোম্পানির শাসনকালে বাংলা (১৭৫৭-১৮৫৮)

ইস্ট-ইন্ডিয়ান কোম্পানির শত বছরের শাসনকালে বাংলার শাসন ব্যবস্থায় নবাবি ব্যবস্থাপনাকে অকার্যকর করা হয়, একই সঙ্গে ১৭৬৫ সালে দিউয়ানি লাভ ও পরবর্তীতে বিচার বিষয়ক সংস্কারের মাধ্যমে কোম্পানির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। ব্রিটিশ গভর্নর শাসনকে বাংলাদেশে দ্রুতই বৃদ্ধি এবং শক্তিশালী করা হয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারত শাসন আইনে (১৭৮৬ খ্রি.) বাংলার ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেলের হাতে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা ন্যস্ত করা হয়। এছাড়া ১৭৯৩ সালের জারিকৃত চিরস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্তের মাধ্যমে বাংলায় ব্রিটিশ অনুগত একটি সংগঠিত জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে, রাষ্ট্র ক্ষমতা ও প্রশাসনে তাদের প্রতিষ্ঠার পথও সুগম করা হয়। মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় রাজস্ব দপ্তর স্থানান্তর, দেওয়ানি ও সদর নিযামত আদালত প্রতিষ্ঠার ফলে যোগাযোগ সুবিধায় বেড়ে ওঠা নতুন ধাঁচের রাষ্ট্র কাঠামোর যাত্রা শুরু হয়। দীর্ঘদিনের সামন্ত জমিদারি-নবাবি ব্যবস্থাকে দুর্বল করার মাধ্যমে কোম্পানির শাসনকে সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যেই এসব পরিবর্তন, স্থানার, সংস্কার ও আইন প্রণয়ন করা হয়। বাংলাকে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ রাজশক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার লক্ষ্যে ১৭৭৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট রেগুলেটিং অ্যাক্ট নামক আইন পাস করে। তবে এটি মূলত সমগ্র ভারতের ওপর ব্রিটিশদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চিন্তা থেকে করা হয়। এই আইন দ্বারা গভর্ণর জেনারেলের পদমর্যাদা, ক্ষমতা এবং সরকার ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো হয়। এতে বাংলার গুরুত্ব সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে এর ফলে ব্রিটিশ ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক দপ্তর, কাজকর্মের পরিসর বৃদ্ধি এবং আধুনিক প্রশাসনিক নগর হিসেবে কলকাতার উত্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭৪-৮৫ খ্রি.), লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৮৬-৯৩ খ্রি.), লর্ড ওয়েলেসলি (১৭৯৮-১৮০৫ খ্রি.) প্রমুখ গভর্নর জেনারেল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ভারতবর্ষে কাজ করেন। বাংলায় কোম্পানি শাসন একটি শক্তিশালী আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এর ফলে দেওয়ানি এবং ফৌজদারি পদে অভিজাত ও শিক্ষিত শ্রেণীর উত্থান ঘটে। সাধারণ মানুষ অবশ্য ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে প্রশাসন, বিচার বিভাগ, সামরিক ইত্যাদি অবকাঠামোর সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি। এর ফলে অবশ্য শোষণ ও বৈষম্যের মাত্রা নতুনভাবে বৃদ্ধি পায়। এক সময় এসব বৈষম্য থেকে সৃষ্টি হয় ক্ষোভ ও বিদ্রোহ। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বাংলায় বেশ কিছু বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল যেগুলোতে সাধারণ মানুষ অংশ গ্রহণ করেছিল। উল্লেখযোগ্য আন্দোলন হচ্ছে ১৭৬০ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন, নীলকর আন্দোলন, তিতুমীরের নেতৃত্বে আন্দোলন। তবে রাজনৈতিক শক্তির উত্থান না ঘটার ফলে এসব আন্দোলন শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্যে পরিচালিত করা যায়নি। কিন্তু এর প্রভাব পড়েছিল একমাত্র সংগঠিত শক্তি সেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে যা ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সূচনা করেছিল। ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যারাকে সিপাহীরা বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করে। এর ফলে বাংলাসহ ভারতবর্ষের সর্বত্র ব্রিটিশ শাসনের ভিত প্রথম বারের মতো ব্যাপকভাবে কেঁপে ওঠে।

ব্রিটিশ সরকারের শাসনকালে বাংলা (১৮৫৮-১৯৪৭):

১৮৫৮ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ রাজতন্ত্র সরাসরি ভারতের শাসনভার গ্রহণ করলে 'ভাইসরয়' পদ সৃষ্টি হয় এবং বাংলাসহ ভারতবর্ষে এক নতুন উপনিবেশিক শাসনের সূচনা ঘটে। প্রথম ভাইসরয় লর্ড ক্যানিংয়ের (১৮৫৮–৬২) সময়েই ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন পাস হয় এবং ১৮৬১ সালে ভারতীয় কাউন্সিল আইন প্রবর্তিত হয়, যা শাসনে ভারতীয়দের সামান্য অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়। পরবর্তী ভাইসরয় লর্ড মায়ো (১৮৬৯–৭২), লর্ড লিটন (১৮৭৬–৮০), লর্ড রিপন (১৮৮০–৮৪) প্রমুখের শাসনামলে প্রশাসনিক কিছু সংস্কার হলেও শোষণমূলক নীতিতে তেমন পরিবর্তন আসেনি। এসময় মুসলিম পুনর্জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন বিচারপতি আমির আলী, নবজাগরণের পথিকৃৎ সৈয়দ আহমেদ খান, ও ডেপুটি আব্দুল লতিফ—যারা শিক্ষার প্রসার, সামাজিক সংস্কার ও মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থানে ভূমিকা রাখেন। এসময় এ অঞ্চলের মানুষ আরও বেশি রাজনীতি ও অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে। কংগ্রেস (১৮৮৫) ও মুসলিম লীগ (১৯০৬) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজনৈতিক অগ্রগতি বেগবান হয়। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের উদ্যোগে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামক একটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করা হলে বাংলায় তীব্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়, যা স্বদেশী আন্দোলনে রূপ নেয়। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের চাপে ১৯১১ সালে এটি রদ করা হয়। এরপর ১৯১৬ সালে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একযোগে লখনৌ চুক্তিতে পৌঁছে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বার্তা দেয়। ১৯২৩ সালের ব্যাংগল প্যাক্টের মাধ্যমে বাংলার রাজনৈতিক সহযোগিতার একটি চিত্র স্পষ্ট হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে বাংলাকে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয় এবং ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টির মধ্যে সরকার গঠন হয়। এ সময় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নতুন উদ্দীপনায় প্রবাহিত হয়; ১৯৪২ সালের ভারত ছাড় আন্দোলনে বাংলার ছাত্রসমাজ, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। কিন্তু হিন্দু-মুসলিম বিভাজন, দ্বিজাতি তত্ত্বের বিস্তার ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ফলে পরিস্থিতি জটিল হয়ে পড়ে। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা, মুখার্জি-সোহরাওয়ার্দীর প্রচেষ্টা, এবং জাতিগত উত্তেজনার পরিণতিতে ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে এবং বাংলা ভাগ হয়ে পশ্চিমবঙ্গ ভারতে এবং পূর্ববঙ্গ পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) হয়।

মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর

হাজী শরিয়ত উল্লাহ

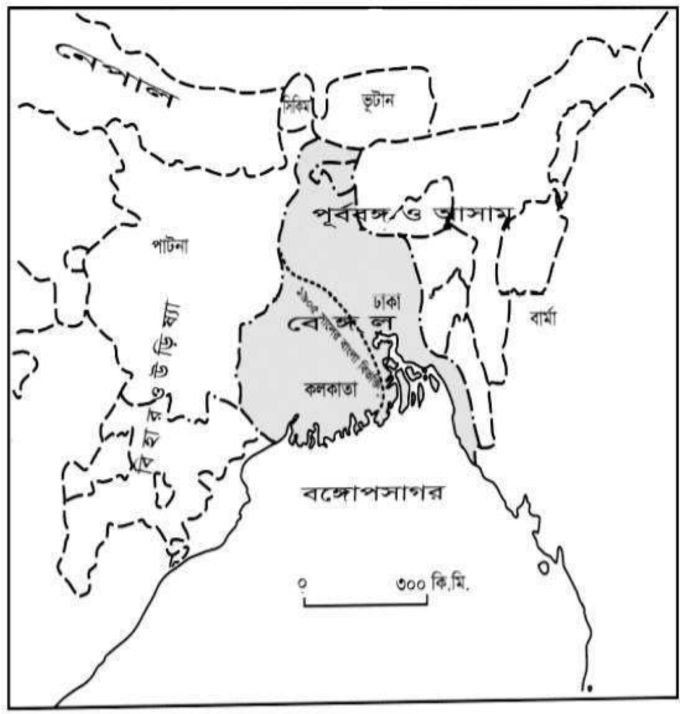

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ

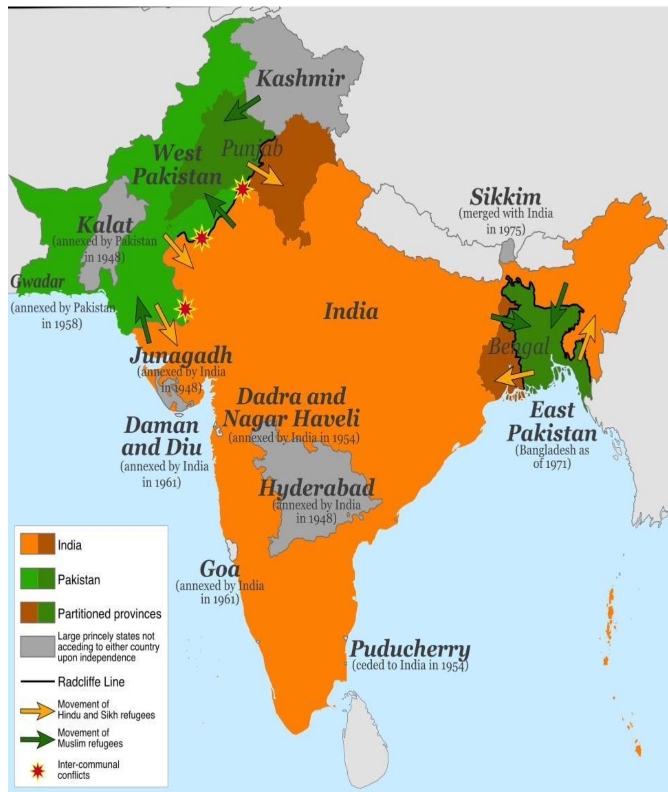

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় (১৯৪৭-১৯৭১):

১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ ভাগ হয়ে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলে পূর্ববঙ্গ পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তানের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। ধর্মের ভিত্তিতে সৃষ্ট এই নতুন রাষ্ট্রের পূর্ব অংশের মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনধারা ও রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ছিল ভিন্ন, কিন্তু শাসনব্যবস্থা ছিল পুরোপুরি পশ্চিম পাকিস্তানকেন্দ্রিক। দেশভাগের পরই শাসকগোষ্ঠী উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলো, যা বাঙালিদের মধ্যে গভীর ক্ষোভ সৃষ্টি করে এবং ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্রদের মিছিলের ওপর পুলিশের গুলিতে সালাম, রফিক, বরকত, জব্বারসহ অনেকে শহীদ হন। এই আত্মত্যাগ বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার ভিত্তি গড়ে দেয়। এরপর ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল বিজয় লাভ করে এবং বাঙালির আত্মপরিচয়ের দাবিকে দৃঢ় করে তোলে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার খুব অল্প সময়েই যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল করে দেয়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণীত হলেও সেখানে পূর্ব বাংলার প্রতি ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি করে আইয়ুব খান ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং ১৯৬২ সালে একটি একনায়কতান্ত্রিক সংবিধান চাপিয়ে দেন। এর বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতা প্রতিবাদ গড়ে তোলে এবং শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে বাঙালির আন্দোলন শুরু হয়।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার

ভাষা আন্দোলনের শহীদগণ

শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান 'ছয় দফা' দাবি পেশ করেন। এই ছয় দফার মধ্যে ছিল পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন, পৃথক মুদ্রা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। এর জেরে ১৯৬৮ সালে শেখ মুজিবসহ কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়, যা পরিণামে ভেস্তে যায় ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। এই গণ-অভ্যুত্থানের ফলে আইয়ুব খান পদত্যাগে বাধ্য হন এবং ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসেন। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে উপকূলবর্তী পূর্ব পাকিস্তানে লক্ষাধিক মানুষ নিহত হলেও কেন্দ্রীয় সরকার কার্যকর ত্রাণ সহায়তা না দেওয়ায় জনরোষ চরমে ওঠে। একই বছরের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অভূতপূর্ব সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে যা তাদের এককভাবে সরকার গঠনের সুযোগ দেয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানায়। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেন, যার প্রতিবাদে গোটা পূর্ব পাকিস্তান জ্বলে ওঠে। শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন যা ২ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত চলে।অবশেষে ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ‘অপারেশন সার্চলাইট’ নামক পরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকাসহ সারা দেশে বাঙালিদের ওপর বর্বর গণহত্যা চালায়। এর ফলে শুরু হয় দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ। এই সময়ে তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত হয় প্রবাসী সরকার (মুজিবনগর সরকার)। ভারতের সীমান্তে আশ্রয় নেয় প্রায় এক কোটির বেশি শরণার্থী। পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে এবং ভারতের সেনাবাহিনী বাংলার মুক্তিসংগ্রামে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে। অবশেষে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পাকিস্তানি সেনাপতি লে. জেনারেল নিয়াজি ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এইভাবে পূর্ব পাকিস্তান জন্ম নেয় একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র ‘বাংলাদেশ’ হিসেবে — যার পেছনে ছিল দীর্ঘ ২৪ বছরের রাজনৈতিক বঞ্চনা, সাংস্কৃতিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক শোষণ ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের গৌরবময় ইতিহাস।

ঢাকার রাজপথে ৬ দফার পক্ষে মিছিল

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের গণহত্যা

মুজিবনগর সরকার: সালাম গ্রহণ

গার্ড অব অর্নার

পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ